ENSEMBLE
A bi-lingual peer reviewed academic journal
ISSN 2582-0427 (Online)
Volume 1, Number 1
March 2019
http://www.ensembledrms.in

বাংলার রেনেসাঁ ও মুসলমান সমাজঃ একটি বিশ্লেষণ

(BANGLAR RENAISSANCE O MUSALMAN SAMAJ: EKTI BISHLESAN)

Dr. Irien Shabnam[1]✉

প্রবন্ধ নির্দেশক সংখ্যাঃ
১৯০১০৬১৩ এন ১ বি এন আই এম

প্রবন্ধ সংক্রান্ত নথিঃ
জমা - ০৬ই জানুয়ারি ২০১৯
গ্রহণ - ২২শে জানুয়ারি ২০১৯
বৈদ্যুতিন প্রকাশ - ২৫শে জানুয়ারি ২০১৯

সূচকশব্দঃ
রেনেসাঁ, রামমোহন, ডিরোজিও, ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দু, মুসলমান, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী, হিন্দু কলেজ, এলিটশ্রেনী, ধর্মসভা, হিন্দুমেলা

সারসংক্ষেপঃ
নবজাগরণের উন্মেষ এবং ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা ও ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই পুরো প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু যুবকেরা, স্বাভাবিকভাবেই তাদের দৃষ্টি পড়েছে নিজের সমাজের তথা শ্রেণীর সমস্যার দিকে, যে শ্রেণীতে শহুরে, শিক্ষিত এবং চাকুরিজীবী হিন্দুরাই ছিল। কারণ রেনেসাঁ ও ব্রাহ্মসমাজের উত্থান থেকে শুরু করে 'হিন্দু মেলা'র ভাবনা পুরো যাত্রাটিই ছিল হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজ সংস্কারকে কেন্দ্র করে। 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রগতির যে সূচনা হয়, বহুদিন পর্যন্ত সেখানে মুসলমান তো বটেই, বর্ণহিন্দু ছাড়া অন্যদের প্রবেশও নিষিদ্ধ ছিল। ফলে পুরো প্রক্রিয়াটিই ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত হিন্দুদেরকে নিয়ে-, তাদেরই স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে। গ্রামে বাস করা মুসলিম এবং দরিদ্রনিম্নবর্ণের হিন্দুরাও এই - প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বাইরেই থেকে যায়। তাই নবজাগরণের উন্মেষ এবং বিকাশে মুসলমানেরা পুরোপুরি অনুপস্থিত। কারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেনী গড়েই উঠতে পারেনি, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজ বিকাশে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা করে থাকে এবং এরাই সামন্ততন্ত্রের শিকল ভেঙে আধুনিকতার আবাহন করে, ফলে যা হবার তাই হয়েছে, সমাজ অগ্রগতির ইতিহাসে অন্তত একশো বছর পিছিয়ে পড়েছে এদেশের মুসলমান সমাজ।

রেনেসাঁর অর্থ যদি হয় *'Typical early stage of Modern age'* তবে বাংলার রেনেসাঁর সূচনা হয়েছিল রামমোহনের হাত ধরেএকথা বললে অত্যুক্তি হয়না—। রামমোহনই সেই ব্যক্তি যিনি প্রথম অনুভব করেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষাসংস্কৃতি-, দর্শনরাজনীতির আলো গায়ে না মাখলে এদেশের মানুষ আধুনিক হতে পারবেনা-। কারণ প্রথম চার " ছিল তারপর শিক্ষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার আর নতুন কিছুমুসলিম শাসন বঙ্গদেশকে যা দিয়ে-শতাব্দীতে ইন্দোদেওয়ার ছিলনা। কারণ মুসলিম সভ্যতা জ্ঞানেবিজ্ঞানে মধ্যযুগীয়তা কাটিয়ে উঠে অগ্রসর হচ্ছিলনা-।" [১] এদিকে ১৭৬৫ খ্রীঃ কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগে থেকেই কলকাতা হয়ে উঠেছিল কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্যের (খ্রীঃ ১৭০০আনুমানিক)

[1] [First Author] ✉ [Corresponding Author] Associate Professor in Bengali, Dr. Meghnad Saha College, Itahar, Uttar Dinajpur, West Bengal, INDIA; Email: iriensh@gmail.com

© Dr. Meghnad Saha College (www.drmscollege.ac.in)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

কেন্দ্র। এই সময়ই তাদের নিজস্ব সামরিক কেন্দ্র ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গও গড়ে ওঠে এবং কোম্পানীর সূত্রে প্রচুর ইংরেজ সিভিলিয়ন এদেশে আনাগোনা শুরু করে। কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে কিছু বাঙ্গালী জমিদারও কলকাতা শহরে বসতি স্থাপন করে এবং এরাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে নতুন নাগরিক অভিজাত ধনিক শ্রেনী হিসেবে গড়ে ওঠে। এরা ইংরেজদের সাহচর্যে থাকলেও কবিগান, বুলবুলির লড়াই, ঘোড়দৌড়, পায়রা ওড়ানো, শ্রাদ্ধে অফুরন্ত টাকা ওড়ানো, মন্দির, ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি নিয়ে একদিকে যেমন মধ্যযুগের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে, অন্যদিকে এরাই আবার টাকা কামানোর তাগিদে নিজস্ব উদ্যোগে ইংরেজী শিখতে শুরু করে। প্রথম পর্বে কিছু ইংরেজ কর্মচারী স্কুল খোলেন, পরবর্তীকালে মিশনারীদের উদ্যোগে কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমস্ত স্কুলেই রামমোহন, দ্বারকানাথ, ডিরোজিও প্রমুখরা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন।

কিন্তু এই সমস্ত কিছুই ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগ। কেউই গোটা জাতির কথা ভাবেনি। রামমোহন প্রথম তা উপলব্ধি করেন এবং ১৮২৩ খ্রীঃ ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে একটি পত্র লেখেন, যার মোদ্দা বক্তব্য হল, এদেশীয়দের জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞানউন্মুক্ত করা বিজ্ঞানের দ্বার-। এই পত্রটিই আমাদের দেশের মুখ প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল বলে মনে করা হয়। তাকে এই চিঠি লিখতে হয়েছিল কারণ তখনও পর্যন্ত শাসক ইংরেজ এদেশীয় শিক্ষাসংস্কৃতি ও ধর্মে - কোনরকম হস্তক্ষেপ করতে সাহস তো করেইনি, বরং যেমন ছিল তেমনটা রাখতে ও বাড়াতে সাহায্য করছিল। এই অবস্থায় রামমোহনের চিঠি তাদেরকে শিক্ষা ও সংস্কারে সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগায়।

ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকে শাসনভার কেড়ে নেবার পরও অনেকদিন পর্যন্ত ফৌজদারি ও বিচার বিভাগে মুসলমান কর্মচারী ও মৌলবীদের প্রয়োজন হতো, কারণ ১৮৩৭ খ্রীঃ পর্যন্ত অফিসকাছারির ভাষা ছিল ফ-ার্সি। এই প্রয়োজন মেটাতে ১৭৮১ খ্রীঃ 'ক্যালকাটা মাদ্রাসা' স্থাপিত হয়। ১৭৯২ খ্রীঃ কাশীতে স্থাপন করা হয় 'সংস্কৃত কলেজ'। ১৭৯৩ খ্রীঃ চার্লস গ্রান্ট নামে এক ভারতহিতৈষী ব্যক্তি এদেশে শিক্ষার দুরবস্থা নিয়ে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন; যদিও তা গৃহীত হয়নি। ১৮০০ খ্রীঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়, ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্যে। ১৮১১ খ্রীঃ লর্ড মিন্টো আবার এদেশীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবনতি বিষয়ে মন্তব্য করেন। এই অবস্থার অবসানকল্পে আরো দুটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় সেই অভাব পূরণ করতে প সংস্কৃত ভাষা)ারবেনা জেনেও(কিন্তু তবুও ১৮১৪ খ্রীঃ থেকে ১৮২৩ খ্রীঃ এর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা হয়নি, বেসরকারী উদ্যোগে 'হিন্দু কলেজ' স্থাপন ছাড়া। ১৮১৪ খ্রীঃ থেকে রামমোহন রায় কলকাতায় বসবাস করতে শুরু করলে শিক্ষানুরাগী ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র তিনিও একজন হিতৈষী ছিলেন। তার সঙ্গে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজনীতা বিষয়ে রামমোহনের আলোচনা হতো। ইতিমধ্যে যে নতুন বিদ্যার খবর নিয়ে এলেন ইংরেজরা ইউরোপের", বিশেষ করে রেনেসান্সের যে ফসল নিয়ে এলেন, তাকে দুবাহু তুলে স্বাগত জানান রামমোহন। তিনি কেবল বঙ্গদেশের বাইরে তাকালেন, তাই নয়, ইউরোপ এবং আমেরিকার ভাবুকদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করলেন.....। সেই ১৮১২ সালে স্পেনের প্রগতিশীল লোকেরা যে বিকল্প সংবিধান রচনা করেন তারা সেই সংবিধান উৎসর্গ করেন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে বসবাসকারী এক অজ্ঞাত লোকের নামে, রামমোহনের নামে।" [২] বোঝা যায় কলকাতায় স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করারও আগে ইউরোপের উদারনৈতিক পন্ডিতদের সঙ্গে তার নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন হয়েছিল। "আত্মীয় সভাধর্ম " আলোচনার জন্য স্থাপিত হলেও এখানেই ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষারবিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে তার কথা হয় এবং এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয় তৎকালীন সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইস্টের কাছে। ১৮১৬ খ্রীঃ মিঃ হাইড শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এবিষয়ে আলোচনা করেন; কলেজ স্থাপনে সকলের মত থাকলেও এর সঙ্গে রামমোহনকে যুক্ত থাকতে দিতে তারা রাজী ছিলেননা। একথা জেনে রামমোহন নিজেই সেখান থেকে সরে আসেন এর) থেকে বোঝা যায় সে সময়েররক্ষণশীল হিন্দুসমাজ রামমোহনকে কী চোখে দেখতো। ১৮১৭ খ্রীঃ কমিটিতে রামমোহনকে না রেখে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়, বলা বাহুল্য, প্রথম থেকেই হিন্দু কলেজ পরিচালিত হয় রক্ষণশীলদের দ্বারা। এই কলেজ কেবল উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়। অথচ মজার ব্যাপার এই হিন্দু কলেজলার ই হয়ে ওঠে বাং-রেনেসাঁর আঁতুড়ঘর এবং এই কলেজকে ঘিরেই জমে ওঠে প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে যারা নবীনের আবাহন করেছিলেন তারা হলেন রামমোহন, ডেভিড হেয়ার এবং ডিরোজিও।

ডিরোজিও ১৮২৮ খ্রীঃ মাত্র উনিশ বছর বয়সে হিন্দু কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তার চুম্বকীয় ব্যক্তিত্ব, প্রখর যুক্তিবোধ, বিচারমনস্কতা, উদারতা ও জ্ঞানের গভীরতা অচিরেই ছাত্রদেরকে মুগ্ধ, আকর্ষিত ও আলোড়িত

করে। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ছাত্রদের মনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের জন্ম হয়েছে যা সে সময়ের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বাঙালি জীবনের জন্য একটি ভীতির কারণ হয়েছিল, কারণ এর ফলে অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস এবং গুরুজনের প্রতি অন্ধ আনুগত্যে চিড় ধরতে শুরু করে। এই পটভূমিতে ডিরোজিওর আবির্ভাব রীতিমত ঝড় তুলে দেয়, ইউরোপীয় যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার হতে থাকে দেশীয় ধর্ম"ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী" রীতিনীতি। গড়ে ওঠে-সংস্কার-, কালাপাহাড়ের মত হিন্দুসমাজ দেহে তারা আঘাত করতে শুরু করে; সমাজে দারুণ অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, চারিদিকে গেলো গেলো রব ওঠে, যার ফলশ্রুতিতে অচিরেই ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত হতে হয় ১৮৩১ খ্রীঃ। ঐ বছরেই ডিরোজিওর মৃত্যু হয়, কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব তখনই অস্তমিত হয়নি, তাদের নানা 'উচ্ছৃংখল' ক্রিয়াকলাপে হিন্দু সমাজে তটস্থ হয়ে পড়ে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত আরো অনেকে ত্যাজ্যপুত্র হয়, কেউ কেউ খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে, অনেকেই চরম হেনস্থার স্বীকার হয়, কিন্তু কেউই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। আদর্শের জন্য প্রাণ পণ করা, দেশ সেই প্রথম দেখলো। কিন্তু সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী বা সুবিস্তৃত হতে পারেনি, যদি হত তাহলে হয়তো বাংলার রেনেসাঁ এবং তার হাত ধরে আসা স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদ অন্য রূপ নিত। কারণ 'যে কোন সমাজের স্থায়িত্ব ও শক্তির প্রধান উৎস হল *institutions* এবং আমাদের দেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের power structure যে সমস্ত ইন্সটিটিউসনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে অন্যতম হল যৌথ পরিবার (*joint family*), জাতিভেদ প্রথা)*caste system*(, বিবাহ প্রথা, ধর্ম ইত্যাদি।' [৩] যৌথ পরিবারের ভিত্তি যে সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্য যেমন গুরুজনদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ইত্যাদিতে ফাটল ধরাতে শুরু করেছিল ডিরোজিয়ানরা, যে কোন ধরণের অন্ধ আনুগত্যেরই বিরোধী ছিল তারা। এরা ধর্ম এবং জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতাও শুরু করেছিল নিজেদের মত করে। - ডেভিড হেয়ারের চরিতাখ্যায়ক স্বর্গীয় প্যারিচাঁদ মিত্র বলেন"'ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না; অনেকে সন্ধ্যা আহ্নিক ত্যাগ করিয়াছিল; তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিকের পরিবর্তে হোমারের ইলিয়াড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।' আবার সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, অনেক বালক ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত সীমান্তে যাইত। তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মুন্ডিত মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ দেখিলেই 'আমরা গরু খাইগো, আমরা গরু খাইগো', বলিয়া চিৎকার করিত।" [৪] ধর্মীয় গোঁড়ামির সম্পূর্ণ উর্দ্ধে উঠে, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সবার উপরে স্থান দিয়ে তারা যে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ যাত্রা শুরু করেছিল, 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি'র ইংরেজদের ধরাশায়ী করতে তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যদিও ধর্ম ও যৌথপরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি সামন্ততন্ত্রে আঘাত না করে তা স্থায়ী হত কি না সে প্রশ্ন থেকেই যায়। নবজাগরণের দৃষ্টি যে নারীর দুরবস্থার দিকে পড়েছিল, তারও সূচনা ঘটেছিল এদেরই হাতে। এরাই প্রথম নারীর অবস্থা নিয়ে সোচ্চার হয় এবং বিধবা বিবাহ নিয়ে কথা বলে।

কিন্তু ইয়ং বেঙ্গলের 'বৈপ্লবিক' কাজকর্মকে ধারণ করার মত অবস্থা সেই সময়ের হিন্দু সমাজের অগ্রসর অংশেরও ছিলনা। সেই তুলনায় বরং রামমোহনের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা অপেক্ষাকৃত বেশী গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। রামমোহন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়েও হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম বিষয়ে সন্দিহান ছিলেননা - বরং তিনি ধর্মহীন শিক্ষাকে ভয় করতেন। একথা ঠিক যে আরবীফার্সি শিক্ষা তার মনে একেশ্বরবাদের বীজ বপণ করেছিল-, কিন্তু তার প্রমাণ খুঁজেছিলেন তিনি বেদবেদান্তেই-। বিদ্যাসাগরও বিধবা বিবাহের সপক্ষে হিন্দুশাস্ত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু তা ছিলো নিতান্তই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখ বন্ধ করতে। তার সংস্কার প্রচেষ্টার সঙ্গে ধর্ম একীভূত হয়ে যায়নি, যদিও তার সংস্কারগুলিও হিন্দুসমাজেরই সংস্কার ছিল তবে তার কারণ ছিল বাঙালি মধ্যবিত্তের জন্মের ইতিহাসের মধ্যে নিহিত, ধর্মচেতনায় নয়। নবাবী আমলের শেষের দিক থেকেই ব্যবসা বাণিজ্য মূলতঃ হিন্দুদের হাতেই চলে যায়, ১৭৯৩খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে, ইংরেজঘনিষ্ট-, নগরের ব্যবসা বাণিজ্যে পয়সা কামানো নতুন উদ্ভূত ধণিক শ্রেনী-যারা প্র)ায় সকলেই হিন্দু(, গ্রামের জমিদারী কিনে নতুন জমিদারে পরিণত হয়। সমাজতাত্বিক বিনয় ঘোষ বলছেন—'উনিশ শতকের শেষপর্বে ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব নীতির ফলে বাংলাদেশের গ্রাম্যসমাজে কমপক্ষে সাত আট লক্ষ লোকের এমন একটি 'শ্রেনী'তৈরি হয়েছে (সামাজিক স্তরায়ন) , যে শ্রেনী ব্রিটিশ শাষকদের স্তম্ভস্বরূপ।.....একটি নতুন জমিদার শ্রেনী, আর একটি নতুন মধ্যস্বত্বভোগী ও গ্রাম্য মধ্যশ্রেনী।..... এরপাশে নাগরিক সমাজে, যেমন কলকাতা শহরে, ব্রিটিশ শাসকরা তাদের বিশ্বাসভাজন আরো দুটি শ্রেনী তৈরি করেছিলেনএকটি নতুন নাগরিক ধনিক শ্রেনী—, আর একটি নতুন নাগরিক মধ্যশ্রেনী। এই মধ্যশ্রেনীর মধ্যে ছোট ছোট ব্যবসায়ী দোকানদার, দালাল প্রভৃতির সংখ্যা অনেক, বাকি নানারকমের চাকরিজীবী। নাগরিক মধ্যশ্রেনীর একটি বিশেষ স্তর হিসেবে গড়ে উঠেছিল বাঙালি ইংরেজী শিক্ষিত এলিটশ্রেনী।' [৫] এই

এলিটদের সম্পর্কে সাঁত্রে যা বলেছেন, তা আমাদের স্মরণে রাখা দরকার—'*The European elite undertook to manufacture native elite. They picked out promising adolescents: They branded them, as with a red hot iron, with the principles of western culture; they stuffed their mouths full with high sounding phrases.....These walking lies had nothing left to say to their brothers; they only echoed.*' [৬] শাসক ইংরেজের প্রত্যক্ষ সমর্থনে এই নতুন সৃষ্ট এলিটরাই হয়ে ওঠে সমাজের প্রতিনিধি তথা মুখপাত্র। আর সমাজের অর্থ দাঁড়ায় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজ, নিম্নবিত্তরা থেকে যায় বৃত্তের বাইরেই। দারিদ্র, গ্রামে বসবাস এবং ইংরেজী শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার ফলে অষ্টাদশক এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি কেন্দ্রি-ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষিত কলকাতা-গড়ে উঠেছিল, তাতে মুসলমানেরা ঠাঁই করে নিতে পারেনি, কিন্তু রামমোহনবিদ্যাসাগরের সংস্কার ছিল মধ্যবিত্তের সমস্যা কে - ঘিরেই। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান সমাজ তার থেকে বাদ পড়েছিল।

কিন্তু তবুও বিদ্যাসাগরের কর্মকান্ডে ধর্ম কখনো চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়নি। অন্যদিকে রামমোহন কিন্তু প্রথম থেকেই ধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছেন। তবে সে ধর্ম রক্ষণশীল পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম নয়, একেশ্বরবাদী উদার হিন্দুধর্ম। এই ধর্মেরই আনুষ্ঠানিক প্রবর্তন করেন তিনি ১৮২৮ খ্রীঃ 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। কেশবচন্দ্র রেনেসাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—'প্রটেষ্টান্ট রিফর্মেশন যেমন ইউরোপীয় রেনেসাঁ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, ঠিক তেমনি ভারতীয় রেনেসাঁ থেকে উদ্ভূত হয়েছে ব্রাহ্ম রিফর্মেশন।' যদিও ইউরোপে রেনেসাঁর আগেই রিফর্মেশন হয়েছিল। যাইহোক, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বহুবিবাহ বন্ধের আয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে রামমোহন আগেই হিন্দু সমাজের চক্ষুশূল হয়েছিলেন, 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করে তিনি পুরোপুরি শত্রু হয়ে যান। কিন্তু 'তিনি নবীনের অভ্যর্থনা করিতে গিয়া প্রাচীন হইতে পা তুলিয়া লন নাই, হিন্দুজাতির কোথায় মহত্ব তিনি তাহা পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং তাহা সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন।' [৭] তাই খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতিও তিনি ঝুঁকে পড়েননি। বরং তার এক বন্ধু উইলিয়াম এডাম ত্রিশ্বরবাদ পরিত্যাগ করে একেশ্বরবাদী হলে, সেই উপলক্ষে শ্রীরামপুর মিশনারীদের সঙ্গে তার বিরোধ আরম্ভ হয়। মিশনারীরা হিন্দু ধর্মকে হীন প্রমাণ করার চেষ্টা করলে তিনি কয়েকটি উপনিষদের অনুবাদ করেন, এবং লেখেন 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার'। তিনি এডামকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেন এবং তার সাপ্তাহিক প্রার্থনার জন্য একটি স্থানের ব্যবস্থা করেন; যেখানে তিনি নিজে যেতেন এবং তার সন্তান ও বন্ধুরাও সেখানে যাতায়াত করতেন। এই সময় তার এক বন্ধু চন্দ্রশেখর দেব তাকে বলেন—'দেওয়ানজী, বিদেশীয়দের উপাসনায় আমরা যাতায়াত করি, আমাদের নিজেদের একটি উপাসনার ব্যবস্থা করিলে হয়না?' [৮] এরপরই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তার প্রধান সহযোগী হন দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী, মথুরানাথ মল্লিক প্রমুখ আত্মীয়সভার সদস্যরা।

একদিকে 'ব্রাহ্মসমাজ' অন্যদিকে 'ইয়ং বেঙ্গল' এই দু'য়ের দ্বিমুখী আক্রমণে হিন্দু সমাজে হুলুস্থূল পড়ে যায় এবং এর 'প্রতিবিধান কল্পে' রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে ১৮৩০ খ্রীঃ 'ধর্মসভা' স্থাপিত হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক সনাতন হিন্দু ধর্মের সপক্ষে জোর সওয়াল করতে থাকেন, গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে সতীদাহের সপক্ষে গভর্নরের কাছে চিঠি পাঠান। এদিকে ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গল এবং রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ' উভয়েই রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের চক্ষুশূল হলেও এদের উভয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিলনা বলেই মনে হয়, কারণ এই দুই দলের মধ্যে মৌলিক নীতিগত পার্থক্য ছিল। রামমোহন ধর্মকে সংস্কার করে তাকে যুগোপযোগী করতে চেয়েছিলেন, আর ডিরোজিওর দল তাকে যুক্তির কষ্টিপাথরে ফেলে বিচার করতে চেয়েছিল, অন্য অনেক কিছুর মতই। এছাড়া যোগসূত্র তৈরী না হওয়ার আরেকটি কারণ বোধহয় ১৮৩০ খ্রীঃ রামমোহন ইংল্যান্ড গমন এবং ১৮৩১ খ্রীঃ ডিরোজিওর মৃত্যু বরণ।

১৮৩৩ খ্রীঃ ইংল্যান্ডে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হলে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনটি বাধার সম্মুখীন হয় এবং দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই সময় দায়িত্বভার হাতে তুলে নেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করেন, যা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে প্রধান ভূমিকা পালন করে। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখপত্র হিসেবে ১৮৪৩ সালের ১৬ই আগষ্ট 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' আত্মপ্রকাশ করে, অক্ষয় কুমার দত্তের সম্পাদনায়। তবে এর সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর। তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' কে ব্রাহ্মধর্মের রূপ দেন। তিনি বলেন-'পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল।' উনিশ শতকের অন্যতম গদ্যলেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ন বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রচার এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য হলেও জ্ঞানবিজ্ঞান-, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও দর্শন

বিষয়ে মূল্যবান রচনাও এখানে প্রকাশিত হত। তার ফলে কেবলমাত্র ধর্মের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিলনা এই পত্রিকা তথা ব্রাহ্মসমাজের সদস্যবৃন্দ। অর্থাৎ প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু ধর্মের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও দর্শন নিয়ে চিন্তা ভাবনা ও চর্চায় নিযুক্ত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর লেখক হলেও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হননি। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অক্ষয় দত্তও পরবর্তীকালে বেদ ও ব্রহ্মে আস্থা হারিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে আস্থা স্থাপন করেন, যাইহোক, দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকেই ব্রাহ্মধর্ম বা 'তত্ত্ববোধিনী সভা' একটি 'এলিটিস্ট' রূপ ধারণ করে। তবে অক্ষয় দত্তের মত অনেকেই বেদকে অভ্রান্ত বলে আর মেনে নিতে পারেননা, শেষ পর্যন্ত তা বাতিলই হয়। তবে উপনিষদকে অবলম্বন করে তার হিন্দুচরিত্রটিকে রক্ষা করা হয় (আর্য)।

১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যন্ত আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন; কেশবচন্দ্রের সঙ্গে একদল শিক্ষিত যুবকও ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেয়। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী যুবকগণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংসৃস্ট হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করিতে লাগিল।' [৯] এই যুবকদের নেতা ছিলেন কেশবচন্দ্র। ব্রাহ্মসমাজে তখনো বর্ণপ্রথা, উপবীত ধারণ ইত্যাদি প্রচলিত ছিল, দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এ নিয়ে কেশবসম্প্রদায়ের বিরোধ বাধে-। নবীন দল সমাজ সংস্কারেও দৃষ্টিপাত করে, এবং স্বাভাবিক ভাবেই তাদের দৃষ্টি পড়ে মেয়েদের প্রতি, তারা নারীশিক্ষায় সচেষ্ট হয়। কয়েকজন তরুণ ব্রাহ্ম নেতার সঙ্গে একত্রিত হয়ে ১৮৬৩ খ্রীঃ উমেশ্চন্দ্র দত্ত 'বামাবোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। এর লক্ষ্য ছিল বাঙালি গৃহবধূদের শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ করা। এরই ফলশ্রুতিতে ঐ বছরই 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। আজ নারীমুক্তির ইতিহাসে 'বামাবোধিনী' একটি মাইল ফলক বলা যেতে পারে।

১৮৬৪ সালে 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' নামে নারীদের জন্য একটি পৃথক উপাসনা সমাজ স্থাপিত হয়। ক্রমে এরা নারীদের অবরোধ মোচনে অগ্রসর হন। এর আগে সমাজে নারী পুরুষের একসাথে চলাফেরার কথা ভাবা যেতনা, এরা তা শুরু করে, প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই। বর্ণভেদ প্রথা এরা আগেই অস্বীকার করেছিল এবার সকল বর্ণের ব্রাহ্মদের মধ্যে বিবাহের প্রচলন করতে এবং উপবীতধারী ব্রাহ্মণদের আচার্য্য হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দেবেন্দ্রনাথ এতদূর যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। সমাজ নবীন ও প্রাচীনে ভাগ হয়ে যায়। প্রাচীন দলটি হয় 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' এবং অন্যটি 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। নবীনদের নেতা হন কেশবচন্দ্র সেন।

১৮৬৬ থেকে '৭০ এর মধ্যে কেশবচন্দ্র পাঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি জায়গায় 'ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করলেন। এইভাবে ব্রাহ্মসমাজের নব উত্থান যখন দেশের শিক্ষিত মানসে আলোড়ন তুলেছিল তখন প্রকাশিত হয়েছে 'হিন্দু পেট্রিয়ট', আবির্ভাব ঘটেছে বঙ্কিম, মধুসূদন, দীনবন্ধুর। শিবনাথ শাস্ত্রী তার 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে বলেছেন"---কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'সোমপ্রকাশ', মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলে এই কালের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, তেমনি আরেক কার্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। তাহা 'ন্যাশনাল পেপার' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় মেলা' নামক মেলা ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেনীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ।" [১০]

উপরোক্ত উক্তি থেকে একথা স্পষ্ট যে 'ব্রাহ্মসমাজ' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে কেন্দ্র করে বাংলায় একটি নব উন্মাদনা সৃষ্টি হয়, যা নবগোপালের নেতৃত্বে জাতীয় ভাবনার জন্ম দিয়েছিল। উইকিপিডিয়া বলছে—' হিন্দুমেলা ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে স্বাদেশিকতার ভাব জাগরণ তথা জাতীয়চেতনার প্রসারের উদ্দেশ্যে আয়োজিত একটি মেলা। এই মেলা 'জাতীয় মেলা' ও 'স্বদেশী মেলা' নামেও পরিচিতি লাভ করে।' হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম বছরের অধিবেশনে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় সেগুলি হল –'হিন্দু সমাজের বাৎসরিক উন্নতি, স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলন'ইত্যদি। দ্বিতীয় বৎসরের ... অধিবেশনে বলা হয়—' আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম কর্মের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য ইহা ভারতভূমির জন্য।' এই কল্পিত স্বদেশ বা ভারত ভূমিতে মুসলমানদের কোন অস্তিত্ব ছিলনা। কারণ রেনেসাঁ ও ব্রাহ্মসমাজের উত্থান থেকে শুরু করে 'হিন্দু মেলা'র ভাবনা পুরো যাত্রাটিই ছিল হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজ সংস্কারমূলক। 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রগতির যে সূচনা হয় সেখানে মুসলমান তো বটেই, বর্ণহিন্দু ছাড়া অন্যদের প্রবেশও নিষিদ্ধ ছিল। ফলে পুরো প্রক্রিয়াটিই ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত হিন্দুদেরকে নিয়ে-, তাদেরই স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে। গ্রামে বাস করা মুসলিম এবং

দরিদ্রনিম্নবর্ণের হিন্দুরাও এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বাইরেই থেকে যায়-। যদিও ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেরীতে হলেও মুসলমানেরা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু সেটা ১৯৩০ এর দশকে। তাই নবজাগরণের উন্মেষ এবং বিকাশে মুসলমানেরা থেকে যায় পুরোপুরি অনুপস্থিত।

১৮৭০ খ্রীঃ কেশবচন্দ্র সেন ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে 'ভারত সংস্কার সভা' স্থাপন করে, কিছু সমাজ সংস্কার মূলক কাজে হাত দেন। ১৮৭২ এ তিনি ভারত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন ও চর্চা শুরু হয়-। ব্রাহ্ম দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর 'অবলা বান্ধব' পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের যুবক যুবতীদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে, তারা নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার জন্য সোচ্চার হয়। এরই ফলশ্রুতিতে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী ১৮৭৩ খ্রীঃ স্থাপন করেন 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়'। এই সময়েই ব্রাহ্মদের বিবাহ পদ্ধতি নিয়ে সমাজে প্রবল গোলযোগ তৈরী হয়, এবং এই প্রশ্ন উঠে আসে যে ব্রাহ্মরা কি নিজেদের হিন্দু মনে করেনা? কেশবপন্থীরা তার উত্তরে বলে-'তাহারা সামাজিক ভাবে হিন্দু হইলেও তাহাদের ধর্ম উদার, আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন একেশ্বরবাদ; সুতরাং তাহাকে ঠিক হিন্দুধর্ম্ম বলা যায়না।' [১১] এর প্রতিক্রিয়ায় সমাজে আবার হুলুস্থূল পড়ে যায়। নবগোপাল মিত্রের 'জাতীয় সভা' এবং কালীকৃষ্ণ দেবের 'ধর্মসভা' বিবাদ ক্ষেত্রে প্রধান ভাবে অবতরণ করে। আদি ব্রাহ্মসমাজের রাজনারায়ন বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' বিষয়ক বক্তৃতা দিতে শুরু করেন, শুধু তাই নয়, ..."১৮৭৯ সালে তিনি জীতেইংরে (রাজনারায়ন বসু) *'An Old Hindus Hope'* নামে একটি পুস্তিকা প্রচার করেন। তাহাতে স্বদেশবাসীকে এক হিন্দু মহা সমিতি গঠন করতে অনুরোধ করেন।" [১২] যা হিন্দু জনসমাজে বিপুল উন্মাদনা সৃষ্টি করে। এই বক্তৃতার পর সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি শিক্ষিত হিন্দুদেরও আস্থা ফিরে আসে। একই সময়ে রামকৃষ্ণের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে, 'ইন্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় সেই সংবাদ প্রকাশিতও হয়। কেশবচন্দ্র ১৮৭৫ খ্রীঃ রামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে তারও ধর্মবোধের পরিবর্তন ঘটে। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে এই সময় তার চিরবিচ্ছেদ ঘ-টে যায়। এদিকে নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সভায় রাজনারায়ন বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' বিষয়ক যে বক্তৃতা দেন, তাতে সভাপতিত্ব করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুভাবে হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচার করা তার চিরদিনের আদর্শ। তিনি মনে করিতেন রামমোহন রায় তাহাকে সেই ভার দিয়াছিলেন।' [১৩] 'সোমপ্রকাশ' লিখিলেন যে, হিন্দু ধর্ম নির্বাণোন্মুখ হইতেছিল, রাজনারায়ণ বাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন; 'সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা'র সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাহার অশেষ প্রশংসা করিয়া রাজনারায়ণ বাবুকে হিন্দুকুল শিরোমণি বলিয়া বরণ করিলেন।" [১৪] অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম কিংবা ব্রাহ্ম সমাজের যে প্রগতিশীল ভূমিকার বিরোধিতা করে 'ধর্মসভা' কিংবা পরবর্তীকালে 'সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা'র জন্ম হয়েছিলো, তাদের মধ্যে আর কোন বিরোধ রইলনা, এভাবে হিন্দু ধর্মের দুটি বিপরীত ধারার সম্মিলন ঘটলো। ১৮৫১ সালে গঠিত হয় ভারতের প্রথম আধা-রাজনৈতিক সংগঠন'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', যার সভাপতি হন রাধাকান্ত দেব এবং সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বাজাত্যবোধের নামে দুই বিরোধী শক্তি আগেই যুক্ত হয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলন না করলেও ইংরেজ বিরোধী মনোভাব তৈরী ও স্বদেশানুরাগ জাগানো এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

'ব্রাহ্মসমাজ' রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধতা করে জন্মলাভ করেছিল বটে কিন্তু তা হিন্দুসমাজকে ছেড়ে বা হিন্দুসমাজের বাইরে কিছু ভাবেনি। আমরা দেখলাম হিন্দু সমাজের বা হিন্দুধর্মের প্রকৃত হিতৈষী তারাই ছিল এবং ধর্মই ছিল ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। শিবনাথ শাস্ত্রী তার 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে বলেছেন--'রামমোহন ধর্মহীন শিক্ষাকে ভয় করিতেন'। নবজাগরণের প্রথম পর্বে যে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু ধর্মকে চালিকা শক্তি করায় এবং ধর্ম সংস্কারই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় শেষপর্যন্ত তা মুখ থুবড়ে পড়লো রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মের চক্রব্যূহেই, যা ক্রমে জন্ম দিল 'হিন্দু পুনরূজ্জীবনবাদ' এবং 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' এর। 'হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ' এবং 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' মোটেই কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ব্রাহ্ম সমাজরে উন্মেষ ও বিকাশের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল তার বীজ, এবং এই সমাজের প্রায় নির্বাণ লগ্নে রাজনারায়ণ বসুর হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টার মধ্যে দিয়ে তা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ যাকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেন; শুরু হয় হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ। তবে আগের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গে এর কিছু পার্থক্য ছিলোরক্ষণশীল -- সমাজ নিজেদের ধর্ম এবং সংস্কার রক্ষায় গোঁড়া ছিল, মুসলমান সংস্পর্শও তারা এড়িয়ে চলতো, যদিও তার সাথে রাজনীতি কিংবা মুসলমান বিদ্বেষ জড়িত ছিলনা। কিন্তু এদেশে 'হিন্দুমেলা' থেকে যে স্বাজাত্যবোধের এবং জাতীয়তাবোধের জন্ম হল তা প্রথম থেকেই হল মুসলিম বিদ্বেষী এবং তার প্রধান ইন্ধনদাতা হল 'এশিয়াটিক সোসাইটি'। "উনিশ শতকের প্রথম পর্বের

'ওরিয়েন্টালিস্ট'—যারা প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্যা শিক্ষার প্রচলন করতে চেয়েছিলেন এবং শেষ পর্বের—'রিভাইভালিস্ট'দের মনোভঙ্গি ও যুক্তির মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই। উভয়েরই বক্তব্য হল সবই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ও হিন্দু ধর্মে আছে, গীতায় সাম্যবাদ পর্যন্ত।" [১৫] এই সোসাইটির গবেষণার মধ্যে দিয়েই তৈরী হয়েছিল এই গৌরবোজ্জ্বল ভারতবর্ষের ধারণা।নিজেদের " স্পর্কে দেশীয়দের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ছিলদেশের ইতিহাস স, কিন্তু 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র গবেষণার ফলে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের ষাট সত্তর বছরের মধ্যে ইতিহাস সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে ভারতবাসীর মনে এক অসাধারণ সচেতনতা জেগে ওঠে। এই সচেতনতা থেকেই তাদের মধ্যে এক ধরণের স্বাজাত্যবোধ দেখা দেয়। 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র গবেষণা অন্যভাবেও এই স্বাজাত্যবোধকে চাঙ্গা করেছিলকোম্পানীর গবেষক কর্মকর্তারা কেবল ভারতের প্রাচীন যুগকে গৌরবোজ্জ্বল - বলে চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হননি, সেই সঙ্গে মুসলিম আমলকে চিহ্নিত করেছিলেন অন্ধকার যুগ হিসেবে। এই তথ্য ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে ধ্বংস করার জন্য নব্য শিক্ষিত ভারতীয়রা মুসলিম আমলকে দোষারোপ করে এক ধরণের তৃপ্তি লাভ করতে আরম্ভ করেন।" [১৬] এখানে একটা বিষয় লক্ষ করার মত, এখানে যে হিন্দুত্বের কথা বলা হচ্ছে, তা আসলে আর্যত্ব। হিন্দু ধর্মের বারো আনা যে অনার্য সংস্কৃতি থেকে সৃষ্ট, তাকে কিন্তু পুরোপুরিই বাদ দেওয়া হয়েছে; এবং এই আর্যত্বকে সাংস্কৃতিক ভাবে আত্মীকরণের কাজটি সুচারু রূপে সম্পন্ন করেছিলো ব্রাহ্ম সমাজ। এইভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য স্থির হয় ভারতের প্রাচীন —হিন্দু যুগকে গৌরবোজ্জ্বল বলে চিহ্নিত করে সাহিত্য রচনা করা এবং তা করতে গিয়ে প্রধান শত্রু হিসেবে উপস্থিত করা 'বিধর্মী বহিঃশত্রু মুসলমানদের', তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেও স্বদেশপ্রেমের অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান বিদ্বেষ। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্ররঙ্গলালের কাব্য এবং মহাকাব্যের সৃষ্টি-, যার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে প্রধানত জেমস টডের 'অ্যানালস এন্ড এন্টিকুইটিস অফ রাজস্থান' গ্রন্থ থেকে। যে গ্রন্থটি লিখিত হয় ব্রিটিশ রচিত মুসলিম বিদ্বেষী ইতিহাসের ছায়ায় (যার অনেক কিছুই আজ অনৈতিহাসিক বলে প্রমাণিত, যেমন আলাউদ্দিনপদ্মাবতীর ঘটনা-), রাজপুতদের বীরত্বব্যঞ্জক নানা কথা ও উপকথাকে নিয়ে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ স্বাধীনতা হীনতার যে গ্লানীর কথা আছে তা মুসলমানদের বিরুদ্ধেই উচ্চারিত হয়েছে, কারণ দেশবাসী হিসেবে মুসলমানদের স্বীকৃতিই দেওয়া হয়নি।তাই 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হেকে বাঁচিতে চায় /' দিয়ে শুরু হয়ে তা পৌঁছেচে—'দারুণ দুর্নীতি দুষ্ট দুরাত্মা দনূজসাধে যবনেরে হিন্দু না / সকল জাতের প্রতি ঘোর অহ/!অধার্মিক বিশ্বাসঘাতক দুরাচার/!বলে মনুজংকার।।কপট লম্পট শঠ পাতক / লকপু।ন্যায়ান্যায় বোধহীন বিষম বঞ্চক/।' আজও আলাউদ্দিনের চরিত্র চিত্রণে এই দৃষ্টিভঙ্গিই কাজ করে যাচ্ছে; যার সাম্প্রতিক উদাহরণ সঞ্জয় লীলা বনশালীর 'পদ্মাবৎ' সিনেমায় আলাউদ্দিনের চিত্রায়ন। তবে সেই একই সময়কালে মধুসূদন এবং দীনবন্ধু সাহিত্য রচনা করলেও তাদের সাহিত্যে ব্রিটিশ বিরোধিতা বা জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে মুসলমান বিদ্বেষ লক্ষ করা যায়না। শুধু মুসলিম বিদ্বেষই নয়, বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু হয়েছিল যেখানে সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে সঙ্গে নিয়ে, সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (কিঞ্চিৎ জলযোগ), অমৃতলাল প্রমুখরা স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী স্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ করে নাটক-প্রহসন লিখছেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষের সময় থেকে তো ভক্তিরসে ভরপুর পৌরাণিক নাটকের প্রবল প্রতাপ শুরু হয়ে গেল এবং সামাজিক বিষয় নিয়ে নাটক রচনা বন্ধ হয়ে গেল। এটি রামকৃষ্ণের যুগ, হিন্দু পুনরুজ্জীবনের যুগ। সাহিত্যাকাশে এসে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকে নতুন যুগের নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হচ্ছে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দু গার্হস্থ্য ধর্মের জয়গান করছেন। অর্থাৎ সমস্ত দিক দিয়ে প্রাচীন হিন্দু গৌরবোজ্জ্বল যুগের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরী করা হচ্ছে। এর পেছনে যে অনুপ্রেরণা গুলি কাজ করেছিল তার কিছু উল্লেখ জরুরীখ্রীঃ শ্রী অরবিন্দ রেনেসাঁ সম্পর্কে বলেন যে ১৯১০—, 'প্রায় দেড়শো বছর ধরে প্রাচীন হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে চর্চার ফলে হিন্দু সভ্যতার পুনর্জন্ম হয়েছে,..... এই প্রাচীন চিন্তার পুনর্জন্মের ওপর নির্ভর করেই ভারতকে এগিয়ে যেতে হবে, ভারতের সভ্যতাকে পুরোপুরি হিন্দুত্ব মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, তা নয়তো ভারতের উন্নতির পথ নেই।' [১৭] যদুনাথ সরকার 'বাংলার ইতিহাস' দ্বিতীয় খন্ডে বলেছেন *'Plassey marked the dawn of a Renaissance more glorious than ever taken place.'* কারণ এই ঘটনার ফলেই পাশ্চাত্য শিক্ষাসংস্কৃতি ও মহান ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয় এদেশের মানুষ যা তাকে আধুনিক করেছে-, এবং ভাবতে কষ্ট হয়, রাজা রামমোহন রায়ও অনেকটা এই মতই পোষণ করতেন। তিনি প্রেস অ্যাক্ট এর বিরুদ্ধে ইংরেজদের কাছে আর্জি জানিয়ে লিখছেন—'.....সেই ব্রিটিশ সম্রাট কি আমাদের দিকে তাকাবেন না, যারা *Divine Providence* এর ফলে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, মুসলিমদের রাজত্ব থেকে আমাদের বাঁচাবার জন্য?' [১৮]

অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে তখন শিক্ষার বিকাশ ঘটেছে সামান্যই। তবুও তারা এই হিন্দু স্বাজাত্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত ভীত)? সালে গড়ে তোলে ১৮৬৩হয়ে ('মহামেডান লিটারারী সোসাইটি'এটি শিক্ষিত মুসলমানদের সংগঠিত — করার একটি প্রচেষ্টা ছিল। সৈয়দ আমির আলির'সেন্ট্রাল মহামেডান আসোসিয়েশন' এরকম আরেকটি প্রচেষ্টা। এভাবে হিন্দু রিভাইভালিজম জন্ম দিল ইসলামিক রিভাইভালিজমের। মুসলিম জনগণের কাছে ১৮৫০ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত পর্বে তুলে ধরা হচ্ছে ইসলামের পুনর্জন্মের কথা। এই যে একই দেশের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পৃথক পৃথক ভাবে রেনেসাঁ আসছে, এরই ভিত্তিতে ব্রিটিশরা বলতে পেরেছিল হিন্দু সভ্যতা ও মুসলিম সভ্যতা এ দুটো আলাদা জাতীয় সভ্যতাদুটো জাতি রয়েছে — ভারতবর্ষে।এ) খান থেকেই এসেছে দ্বিজাতি তত্ত্বের ধারণাঐতিহাসিক সুশোভন সরকারের মতে এর পেছনে কার্যকর ছিল (রেনেসাঁর সীমাবদ্ধতা। সেই সীমাবদ্ধতাগুলি হল(১"— আমাদের জাগরণের অধিকাংশ প্রতিনিধিই প্রগতিকে ব্রিটিশ শাসনের সমার্থক হিসাবে গণ্য করেছে ।.....২(আমাদের রেনেসাঁসের আলোকপ্রাপ্তরা আমাদের জনগণের ব্যাপক অংশের থেকে দুস্তর ব্যবধানে অবস্থান করেছেন, বাস করেছেন তাদের এক নিজস্ব জগতে। ৩আমাদের আন্দোলনের জাগরিত ভদ্রলোকদের (মধ্যে সাধারণত বিরাজমান হিন্দুধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব মুসলিম চেতনাকে বিচ্ছিন্ন না করে পারেনি। যার পরিণতি হয়েছিল দুর্ভাগ্যজনক, এবং আমাদের বিদেশীয় ব্রিটিশ শাসকদের কাছে আনন্দদায়ক।" [১৯] আমাদেরও মনে হয়, এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারলে হয়তো ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হত।

গ্রন্থঋণঃ

১) মুরশিদ, গোলাম : হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৬,পৃঃ ৯৯
২) প্রাগুক্ত : পৃঃ ২১৬-২১৭
৩) ঘোষ,বিনয় : বাংলার নবজাগরণঃসমীক্ষা ও সমালোচনা, গ্রন্থঃ বাংলার রেনেসাঁস ।পিপলস বুক সোসাইটি, কল- ৭৩, মার্চ ২০০৬, পৃঃ২১
৪) শাস্ত্রী, শিবনাথ : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ পাব্লিশার্স-কলকাতা-৯, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃঃ ৭১,
৫) ঘোষ,বিনয় : বাংলার নবজাগরণঃসমীক্ষা ও সমালোচনা, বাংলার রেনেসাঁস, সম্পাদকঃ দীপংকর চক্রবর্তী, কল- ৭৩, মার্চ ২০০৬, পৃঃ ১৭
৬) *Preface, Fanon*: : *The wretched of the earth, Grove Press.*
৭) শাস্ত্রী,শিবনাথ : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ পাব্লিশার্স-কলকাতা-৯, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃঃ ৬৬
৮) প্রাগুক্ত : পৃঃ ৬৮
৯) শাস্ত্রী,শিবনাথ : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ পাব্লিশার্স-কলকা-৯, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃঃ ১৬২
১০) প্রাগুক্ত : পৃঃ১৬৯
১১) শাস্ত্রী,শিবনাথ : পৃঃ২০৪
১২) প্রাগুক্ত : পৃঃ ২১৫
১৩) প্রাগুক্ত : পৃঃ১৮১
১৪) প্রাগুক্ত : পৃঃ২১৫
১৫) ঘোষ,বিনয় : বাংলার নবজাগরণঃসমীক্ষা ও সমালোচনা, বাংলার রেনেসাঁস, পিপলস বুক সোসাইটি, কল-৭৩, মার্চ ২০০৬, পৃঃ১০৫
১৬) মুরশিদ, গোলাম : হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা। বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ-জুন-২০০৬, পৃঃ২৩
১৭) দে,বরুণ : 'বাংলার পুনর্জন্ম', বাংলার রেনেসাঁস, সম্পাদকঃ দীপংকর চক্রবর্তী, পিপলস বুক সোসাইটি, কল- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৬, পৃঃ ৪৭
১৮) প্রাগুক্ত : পৃঃ ৫০
১৯) সরকার ,সুশোভন : নোটস অন দি বেঙ্গল রেনেসাস প্রসঙ্গেঃ সংযোজনী টীকা ,বাংলার রেনেসাঁস ,সম্পাদকঃ দীপংকর চক্রবর্তী, পিপলস বুক সোসাইটি, কল- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৬ ,পৃঃ১১

গ্রন্থসূচীঃ

১) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাব্লিশার্স, কলকাতা৯।
২) বাংলার রেনেসাঁস : সম্পাদকঃ দীপংকর চক্রবর্তী ,পিপলস বুক সোসাইটি, কল ৭৩।
৩) হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি : গোলাম মুরশিদ ,অবসর প্রকাশনা, ঢাকা।
৪) বাংলা নাট্যরীতি : বিষ্ণু বসু, পুনশ্চ, কলকাতা ১০।
৫) বাঙালি মধ্যবিত্তের থিয়েটার (১খন্ড) : ড.প্রসূন মুখোপাধ্যায়, প্রজ্ঞা প্রকাশন, কলকাতা ৯।
৬) বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক : নজরুল ইসলাম, মিত্র ও ঘোষ, কল- ৭৩।